Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 343–350
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ : একটি তুলনাত্মক পর্যবেক্ষণ

শুভঙ্কর চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : shubhankarchatterjee88@gmail.com

Keyword

জনশিক্ষা, চরিত্রগঠন, আত্মকর্তৃত্ব, মাতৃভাষা, মনুষ্যত্ব, স্বনির্ভর, কর্তাভজা, বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়।

Abstract

ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কাছে ন্যূনতম আস্থা অর্জন করতে পারেনি। সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য ইংরেজি ভাষাবাহিত পাশ্চাত্যের তৎকালীন শিক্ষা বিশ্বের প্রভূত জ্ঞান আহরণের সহায়ক হলেও তার সঙ্গে দেশজ ভাব ও সংস্কৃতির কোনোরূপ সংস্পর্শ ছিল না। মনুষ্যত্ববর্জিত সেই শিক্ষা আমাদের একনিষ্ঠ দাসপ্রবণতা অর্জনে যতটা পারঙ্গম করে তুলেছিল, তার সামান্য অংশ ব্যয় করেনি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের স্বনির্ভরশীলতায় বলীয়ান ক'রে তুলতে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার এই অন্তর্নিহিত কলুষ দূর করতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও তার কার্যকারিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, দু'জনেই আপন ধীরপ্রাজ্ঞ মতামত বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা (১৯০৮) গ্রন্থে তো বটেই, এছাড়া শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালের বিভিন্ন ভাষণে আর বিপুল সাহিত্য ও চিঠিপত্রের নানান প্রকোষ্ঠে মণিমুক্তোর মতো বিছিয়ে রয়েছে শিক্ষাসম্পর্কিত তাঁর সুচিন্তিত ধারণারাজি। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম এবং খানিকটা বিশ্লিষ্টও বটে। ছোট ছোট গদ্য ও সাময়িক কিছু ভাষণ থেকে তাঁর বক্তব্যের নির্যাস আহরণ ক'রে নিতে হয়। তবু সামগ্রিকভাবে শিক্ষাসম্বন্ধীয় উভয়ের ধারণাকে পাশাপাশি রাখলে মিল-অমিলের একটি স্পষ্ট রূপরেখা আমাদের চোখে ধরা দেয়, যেখান থেকে এই দুই মনীষার শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার তুল্যমূল্য বিচার স্বভাবতই চলে আসে। যেমন, দেশজ মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের কথা উভয়ে বললেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষার ওপর, এরজন্য বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। ঠিক এই বিষয়েই বিবেকানন্দের আবার পক্ষপাতিত্ব ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রতি, প্রাচীন ভারত সংস্কৃত অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে একদিন যে পরিপূর্ণ সত্যের সন্ধান পেয়েছিল, বর্তমান যুগমানসে তিনি সেই শাশ্বত বিদ্যার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। এধরণের কিছু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও শিক্ষা বিষয়ে বেশকিছু ক্ষেত্রে তাঁদের মৌল সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য যে আত্মকর্তৃত্ব অর্জন, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কোনো দ্বিমত ছিল না। আপন স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের বিদ্যাকে আহরণ করবার কথা বলেছেন উভয়েই। আবার শিক্ষাদাতার ভূমিকায়

একজন শিক্ষকের থেকে গুরুর প্রয়োজনকে দু'জনেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, যিনি কেবল ছাত্রদের প্রথাগত পাঠের শিক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত থাকবেন না বরং দৈনন্দিন জীবনাচরণের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপটি উন্মুক্ত ক'রে দেবেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মুখ্য কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তাদর্শনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করবার প্রয়াস নেব।

Discussion

মধ্যযুগের ইতালির মতো উনিশ শতকের বাংলায় আদৌ নবজাগরণ ঘটেছিল কিনা এবং কিছু ঘটে থাকলে তাকে সর্বার্থে 'নবজাগরণ' বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত, -এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে যে বিষয়টা কোনো বিতর্ক ছাড়াই প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, তা হল, গোটা উনিশ শতক জুড়ে একাধিক বিশ্বমনীষার বঙ্গের মাটিতে জন্মগ্রহণ। এই শতাব্দীর ছয়ের দশককে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান বলতে হয়, কারণ, এই দশকের প্রথমদিকে ঠিক দু-বছরের ব্যবধানে যে দু'জন ব্যক্তিকে আমরা পেলাম তাঁদের অনতিক্রম্য প্রভাব সমাজ-সংস্কৃতির বুকে আজও সমান ভাবে ক্রিয়াশীল। **১৮৬১** ও **১৮৬৩**। জোড়াসাঁকো ও সিমলা স্ট্রিট। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। উভয়ের কাজের পরিধি ও পরিসর ভিন্ন হলেও এক জায়গায় তাঁদের সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়, ব্রিটিশ শাসনাধীন কালে একটি বিষয়ে দু'জনেই অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। সেটি হল শিক্ষা। ঔপনিবেশিকতার বেড়াজালের মধ্যে থেকেও স্বদেশীদের উপযোগী শিক্ষার প্রয়োগ ও সম্ভাবনা বিষয়ে উভয়ে নিজের নিজের মতো ক'রে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ ঘটান।

জনসাধারণের শিক্ষা–

আমাদের দেশে শিক্ষাসম্বন্ধীয় যেসব সমস্যা রয়েছে, তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর একটা বিষয় হল, শিক্ষাব্যবস্থার অসাম্যতা। বস্তুত, এদেশে শিক্ষা বরাবর মুষ্টিমেয় জনের কুক্ষিগত হয়ে থেকেছে, তা কোনো কালে সর্বস্তরে সমানভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, **১২৭৯**) প্রকাশের অন্যতম প্রধান কারণই ছিল শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দূর করে তাকে সর্বজনের আয়ত্তাধীন ক'রে তোলা। শিক্ষা প্রকৃতঅর্থে সমাজের পক্ষে তখনই মঙ্গলজনক ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে যখন তা সুশিক্ষিতের ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে দেশের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বার উদারতা অর্জন করতে পারবে। তৎকালে সমাজে প্রচলিত 'ফিলটর ডৌন' শিক্ষার বিধিব্যবস্থা কীরকম ছিল, 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' অংশে তার উপযোগিতার বর্ণনা পাওয়া যায়, -

> "কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল বাঙালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে!"[১]

এখানে বঙ্কিম যে উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর বর্ণনাকারী মাত্র সেকথা বলা বাহুল্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই অবস্থা বিশ শতকে এসেও তার চারিত্র্যবদল করেনি। তাই বঙ্কিমের এহেন লজ্জাজনক বিবরণের প্রায় চল্লিশ বছর পরে শিক্ষাব্যবস্থার তথাকথিত উন্নতিসাধন কালে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকেও শিক্ষায় অসাম্যতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে ভাবতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিক্ষার সর্বজনীন বিকাশ যাতে সম্ভব হতে পারে, তার জন্য রবীন্দ্রনাথও জনশিক্ষার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় তাই ব্যক্তির থেকে সমষ্টির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁর মতে, দেশের প্রত্যেকটি জনগণকে ন্যূনতম শিক্ষাদান না করে কেবলমাত্র সংখ্যালঘু কিছু মানুষকে উচ্চশিক্ষার অন্তিম সোপানে আরোহণ করার ব্যবস্থা আসলে শিক্ষা জিনিসটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্লভ ও দুর্মূল্য ক'রে তোলা। এতে কোনোভাবে দেশের মঙ্গল সম্ভব নয়। আইন-আদালত থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত সরকারি বিধিব্যবস্থায় নিম্নসাধারণের যে ভয়-ভীতি ও অপারঙ্গমতা, এর নেপথ্যে আছে শিক্ষাকে সর্বস্তরের মধ্যে সমানভাবে বিস্তার করতে না পারা। এই চরম অসাম্যতার পিছনে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণাকে খানিকটা দায়ী করে রবীন্দ্রনাথের তির্যক মন্তব্য, -

> "জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না, এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ তাই দেশের মানুষকে সত্যি সত্যি আপন ক'রে পাবার জন্য স্বাজাত্যবোধের অহমিকার পথ বাতলে দেননি, সমাজে সুশিক্ষার সম্প্রসারণের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বিবেকানন্দের সমগ্র শিক্ষাচিন্তার মূল কথাটি হল চরিত্র গঠন বা 'Character building'। তাঁর 'complete education'-এর তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের বিকাশের ভূমিকা অপরিসীম। বিবেকানন্দের আদর্শ চরিত্রের মধ্যে উদাত্ত হৃদয়, অফুরান সাহস, লোহার মতো দৃঢ় মাংসপেশির সঙ্গে উত্তম বুদ্ধিমত্তাও সমানভাবে আবশ্যক। এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সুশিক্ষার। তাই আপামর জনসাধারণের কাছে শিক্ষার সহজলভ্যতা বিষয়ে তাঁকেও মত প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। একজন উচ্চমর্যাদার ব্রাহ্মণের চেয়ে নীচ-অস্পৃশ্য চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করেছেন। বস্তুত, সমাজের উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ সহজাতভাবে শিশুকাল থেকে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সবরকম আনুকূল্য পেয়ে থাকে আর ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র সেই একই সমাজ একজন তথাকথিত নিম্নবর্ণের ব্যক্তিকে লাঞ্ছনা, অবহেলা ও অত্যাচারের শিকার বানিয়ে নেয়। একমাত্র শিক্ষার আলোক দ্বারা সমাজের ভয়াবহ এ নিষ্ঠুরতা দূর করা সম্ভব। দরিদ্রদের শিক্ষাদানের জন্য বিবেকানন্দ একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন, তা হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ দিয়ে আসা। এই ব্যবস্থায় পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষদেরও নিয়োগ করা যেতে পারে, যখন গ্রামের অধিবাসীগণ কায়িক পরিশ্রমের পর কোনো একটি গাছের ছায়ায় নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করে থাকেন, অবসরের সেই মুহূর্তে দু-একজন শিক্ষিত সন্ন্যাসীদের দ্বারা গল্পচ্ছলে বা মানচিত্র ও গ্লোবের সাহায্যে তাঁদের প্রাথমিক কিছু শেখান যায়। বিবেকানন্দের পরামর্শ, সম্ভব হলে তাঁদের জন্য সান্ধ্যকালে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করাও যেতে পারে। সেখানে হাতে-কলমে কিছু প্রথমস্তরের শিক্ষা তাঁরা যা পাবে, তা সারাজীবন বই পড়ে পাওয়া শিক্ষার চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না।[৩] বিদ্যার্জনের প্রাতিষ্ঠানিক ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে সববয়সের ও সবশ্রেণির মানুষদের জন্য প্রস্তাবিত এ শিক্ষাপদ্ধতি ঔপনিবেশিক যুগের ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত জনহিতকর।

বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের আলোক না-পাওয়া এসব দুর্ভাগা মানুষদের জন্য যেরকম অবৈতনিক শিক্ষাপ্রণালীর কথা ভেবেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় তাঁদের শিক্ষালাভের আরেককরকম উপায়ের হদিশ পাওয়া যায়। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষাসচিবের কাছে বিদ্যার সংস্পর্শহীন নারী - পুরুষদের জন্য দেশব্যাপী প্রাদেশিক পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন। 'পুনশ্চ' শিরোনামে চিঠির একটি বিশেষ অংশে শিক্ষাবিভাগের কাছে তাঁর ঐকান্তিক আর্জি ছিল, -

> "দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে।"[৪]

সুশৃঙ্খল এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে নিজেদের পড়াশোনা জারি রাখতে পারত এবং তার পূর্ণ মূল্যায়ন ঘটা সম্ভব হত ওইসব পরীক্ষাকেন্দ্রে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মধ্যে দিয়ে। এর বিনিময়ে প্রাপ্ত তাঁদের শিক্ষার উপাধি সমাজ ও জীবিকা-উভয় ক্ষেত্রে যথোচিত প্রয়োজন সাধনের পথে সহায়ক হত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাদেশিক পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আর্জি কেবল একটি চিঠিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, ১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণেও (পরে যা 'শিক্ষার বিকিরণ'' পুস্তিকাকারে বের হয়) প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষাবিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সেদিন এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষাসংসদ একক প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশকিছু রবীন্দ্র প্রস্তাবিত পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করবার উদ্যোগ গ্রহণ ক'রে।[৫] অন্যদিকে ঔপনিবেশিক যুগে প্রস্তাবিত বিবেকানন্দের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ নিদর্শন এখনও গ্রামে-গঞ্জে অল্প পরিমাণে হলেও দেখতে পাওয়া যায় এবং এ ধরনের জনশিক্ষা প্রচারমূলক কাজে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, আশার কথা এটাও।

শিক্ষা ও আত্মকর্তৃত্ববোধ—

শিক্ষা যে মাধ্যম থেকে গ্রহণ করা হোক না কেন তা যেন শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরতায় সহায়ক হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ দু'জনেই সমধর্মী মত পোষণ করেছেন। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে স্বাবলম্বী হতে শেখায়, তাঁকে আত্মকর্তৃত্বের অধিকারী ক'রে তোলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, ব্রিটিশশাসিত ভারতে ইংরেজি মাধ্যমের 'কলে-ছাঁটা বিদ্যা'-র প্রভাবে বাঙালি ছাত্ররা কেমনভাবে পঙ্গু ও পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এর অন্যতম কারণ হল, ভাষার সঙ্গে ভাবের বিরোধ। ছোটবেলায় বাঙালিশিশুকে ইংরেজি পড়তে হয় একপ্রকার বাধ্য হয়ে, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, বিদেশি সেই সমাজ-পরিবেশের সাথে শিশুর কোনোরকম পূর্বপরিচিতি না ঘটায় সে পরীক্ষায় পাশের তাগিদে পাঠ্যগুলি কোনোপ্রকারে গলাধঃকরণ ক'রে বটে কিন্তু অন্তর থেকে সেগুলিকে গ্রহণ করা তার সামর্থ্যে কুলায় না। কারণ, আশৈশব বাংলার যে আটপৌরে ঘরে তার বেড়ে ওঠা, যে বন্ধু-বান্ধব ও সুহৃদদের মাঝে তার নিত্য আবর্তিত দৈনন্দিন যাপন, সর্বোপরি বঙ্গপ্রকৃতির যে মধুর শ্যামলিমা তার শৈশব ও কৈশোরকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে,-এর কোনোটির প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না বিদেশিভাষার প্রাইমারগুলোয়। ফলত শিক্ষার সঙ্গে জীবনের অনির্বার্য এক ব্যবধান শিক্ষার্থীকে ক্রমশ নিজের শিকড় থেকে, নিহিত আত্মপরিচয় থেকে দূরবর্তী ক'রে তোলে। একদিকে তার পক্ষে বিদেশি ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণরূপে আত্মীকরণ করা সম্ভব হয় না, আবার দেশজ রীতি ও সংস্কৃতির পুরোপুরি বশবর্তী হওয়াও একপ্রকার দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এ দুইয়ের টানাপোড়েনে সে আত্মকর্তৃত্বহীন এক পরজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়, যেখানে সর্বদা ওপরমহলের নির্দেশ ব্যতিরেকে স্বচেষ্টায় কোনো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এহেন 'কর্তাভজা' শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবরূপে আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি পর্যন্ত কোনো এক অদৃশ্য ওপরওয়ালার অঙ্গুলিহেলনে চালিত, তাকে 'ভূতের উপদ্রব' এবং 'অদ্ভুতের শাসন' থেকে মুক্তি দেওয়া আজও সম্ভব হল না। 'লিপিকা' (১৯২২)-র অন্তর্গত 'কর্তার ভূত' রচনায় আত্মনির্ভরতায় নিতান্ত অক্ষম অতীতবিলাসী এই জাতির ভবিষ্যত শানিত বিদ্রূপের ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, -

> "এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের মতে, নিজেদের স্বভাবের এই দুর্বলতার জন্য আমরা কোনোকালে স্বরাজ অর্জন করতে পারলাম না, দেশে একের পর এক রাজার আবির্ভাব ঘটে তাঁরা আমাদেরই ওপর কর্তৃত্ব করে গেল, অথচ আমরা চিরকাল রইলাম তাঁদের অনুগত আজ্ঞাবাহী রূপে। শিক্ষার মতো একান্ত প্রয়োজনের ব্যাপারকেও আমরা আবেদন-নিবেদন ও ওপরমহলের অকস্মাৎ কৃপাদৃষ্টির উপর ছেড়ে দিয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে অলসভাবে সময় কাটিয়েছি, এরজন্য কখনও আন্তরিক তাগিদ অনুভব করিনি। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট বীক্ষা, -

> "শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই।"[৭]

শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের ব্যক্তিগত ওজর নেই বলেই দেশব্যাপী অবুদ্ধির রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা তার পদতলে হাত জড়ো ক'রে বসে আছি, যা মনুষ্যত্বের চরম অপমানের সাক্ষী। বিভিন্ন বক্তৃতায় ও প্রবন্ধের সাথে সাথে কবিতায় পর্যন্ত জাতির এই মানসিক অচলাবস্থার তীব্র বিরুদ্ধাচারণ করতে দেখা গিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। চিত্রা (১৮৯৬)-য় ভগ্ন, স্বাস্থ্যহীন নির্জীব মানুষগুলির হৃদয়ে নতুনভাবে উদ্যম সঞ্চারে তাই তিনি সাহস জুগিয়ে বলেছেন, -

> "মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে; যা
> র ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
> যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;"[৮]

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকদের একটি পর্বতের সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, অটল-অচল পর্বত কখনও নড়ে না, মানুষকেই তাঁর প্রয়োজনের গরজে তার দিকে নড়তে হয়। তেমনই আমাদেরও শিক্ষার উন্নতি করতে হলে নিজেদের প্রয়োজনের বিষয়টি কোনো এক কর্তার ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত রাখলে চলবে না, নিজেদেরই তাগিদে 'আমরা চাই' কথাটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে হবে।

বিবেকানন্দের প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত শিক্ষার মধ্যেও নানাভাবে আমাদের এই স্বভাবজনিত আলস্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে, শিক্ষা যে কোনো জায়গা থেকে গ্রহণ করা হোক না কেন, তা যদি মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক এবং দেশ ও দশের কল্যাণে ব্যবহারের উপযুক্ত না হয়, তবে তার কোনো সার্থকতা নেই। তাই উপনিষদ-এর মহৎ আদর্শগুলি সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য তাঁকে বারবার উৎসাহ জোগাতে দেখা গিয়েছে, যাতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সমানভাবে সেই প্রাচীন ভারতের আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে শিক্ষাকে নিজের স্বরূপানুযায়ী গড়ে নেবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষার অপূর্ণতাজনিত সমস্যার দূরীকরণে পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিদ্যাকে একেবারে অস্বীকার করেননি বিবেকানন্দ, তবে তার হুবহু নকলনবিশি নয়, পশ্চিমের বিদ্যাকে আমাদের দেশের সমাজ-পরিবেশের উপযুক্ত ক'রে গড়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। 'অপর' বিদ্যাকে 'আপন' ক'রে নেবার আশ্চর্য সামর্থ্যবোধের জন্য রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁকেও জাপানের স্তুতি করতে দেখা গিয়েছে। জাপান ইউরোপের থেকে নানাধরনের বিদ্যা গ্রহণ করলেও সেগুলি তারা দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের মতো ক'রে গড়ে নিয়েছিল। বিলেতের বিদ্যাকে স্বদেশের ছাঁচে রূপান্তর করবার তাদের সে কৌশলের প্রশংসা ক'রে জাপান সম্পর্কে বিবেকানন্দের উক্তি, -

> "সেখানে এখানকার মতো বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয় নাই।"[৯]

অথচ আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের সমস্তকিছু বিনা বিচারে মেনে নেওয়ার অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তিকে বিবেকানন্দ তীব্র বিরোধিতা করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষকে সর্বাগ্রে তাই স্বনির্ভর হবার মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত করতে চেয়েছেন যা দেশের সমগ্র চেতনাকে পূর্বের রিক্ততার পথে কিংবা পশ্চিমের বহুলতার পথে নিয়ে যাবে না, যা পূর্ণতার শান্ত পথে চালিত হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনে ম্রিয়মাণ স্বাদেশিক ঐক্যকে দৃঢ় ও মজবুত ক'রে তুলবে।

আদর্শ শিক্ষার মাধ্যম : দুটি তুল্যমূল্য ভাবনা–

জাপানের মতো ভারতবর্ষেও আত্মকর্তৃত্বের প্রতিচ্ছবি দেখতে হলে শিক্ষার সমস্ত স্তরে মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ, বাইরের শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যদি আপন ভাবে আহরণ করবার শক্তি অর্জন করতে পারে তবেই তার সার্থকতা আর তার উপেয় হিসাবে মাতৃভাষাই প্রধানতম সহায়। আফশোসের বিষয়, আমাদের উচ্চশিক্ষার বাহন বিদেশিভাষা অথচ স্বাভাবিক চিন্তার মাধ্যম হল মাতৃভাষা। শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষার এই বিচ্ছেদের দরুন উচ্চঅঙ্গের ভাবনাচিন্তা করবার সাবলীল ক্ষমতা আমাদের জন্মায় না। ঔপনিবেশিককালে উচ্চশিক্ষায় কেবল ইংরেজিভাষার একচ্ছত্র প্রতাপকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। ব্রাত্য মাতৃভাষার সপক্ষতা ক'রে তৎকালের শিক্ষাবিভাগের উদ্দেশে পরপর তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে তাঁকে বলতে শোনা গেল, -

> "যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজিভাষায় জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?"[১০]

এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষার অন্দরে বাংলাভাষার প্রবেশ ঘটানোর একটা উপায়ের হদিশ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পরামর্শ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বিভাগে যেমন ইংরেজিশিক্ষার আয়োজন, তেমনই বহির্বিভাগে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও বাংলাভাষায় পঠনপাঠনের একটি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে যেসব ছাত্র ইংরেজি ভাষায় পটুত্ব অর্জনে ততটা সক্ষম নয়, তাঁরাও উচ্চশিক্ষার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে না। রবীন্দ্রনাথ আশা রাখছেন, -

> "এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলাভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। ...ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।"[১১]

উচ্চশিক্ষায় পঠন-পাঠনের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার অভিষেক ঘটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়' ভাবনার উদ্ভব। সুশিক্ষিত বাঙালি যখন নিঃসন্দিগ্ধভাবে পাশ্চাত্যের ভাষা ও বিদ্যাকে জ্ঞানার্জনের একমাত্র সোপানরূপে গ্রহণ করতে চলেছে, সামাজিক পরিসরে মাতৃভাষার অবস্থান যখন দুয়োরাণীর মতো প্রায় উপেক্ষনীয়, ইংরেজিয়ানার সেই ঘূর্ণাবর্তে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বোচ্চস্তরে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তুলতে রবীন্দ্রনাথের এহেন প্রস্তাব সমাজ-পরিবেশের নিরিখে

নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক পরিচয়। তবে শুধু তত্ত্বগতভাবে সপক্ষতা নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা দেখে থাকব রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে কেমন নিবিড়ভাবে লালন করেছিলেন, প্রথম জীবনে বাংলাভাষায় পঠন-পাঠন কীভাবে বালকের সুস্থ মানসিক গঠনে প্রভূত সহায়তা করেছিল এবং তার সুদূরপ্রসারী ফল পরবর্তীকালের ইংরেজিশিক্ষাকে কেমন স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, এসব কথা জীবনস্মৃতি (১৯১২)-তে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। বস্তুত, মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনাভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভব করেছিলেন পরবর্তীকালে তাই এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি এত নিঃসন্দিগ্ধভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছেন।

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায় মাতৃভাষার উপযোগিতার প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সংস্কৃতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেখেছেন, সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণমাত্রে জাতির মধ্যে একটি গৌরব, একটি শক্তির ভাব সঞ্চারিত হয়। প্রাচীন ভারত সংস্কৃত অধ্যয়নের দ্বারা একদিন যে পূর্ণ সত্যের সন্ধান পেয়েছিল, শাশ্বত সেই আদর্শকে বর্তমান যুগমানসে পুনরায় সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। সাধারণের আত্মচেতনার এই মহতী প্রয়াসে উপনিষদ-এর অপরিসীম গুরুত্বের কথা বারবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বৃহৎ শক্তির আধার উপনিষদ-এর প্রসঙ্গসূত্রে বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায় বিভিন্নভাবে ধর্মের অনুষঙ্গ চলে আসে। তাঁর মতে, ছাত্রদের জীবিকা অর্জনের জন্য কারিগরি কিংবা অন্য যে ধরনের বিদ্যায় শিক্ষিত করা হোক না কেন, তাঁদের যেন ধর্মশিক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম বলতে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী মন নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু আচার পালন করা নয়, ধর্ম তাঁর কাছে ছিল সমস্ত শিক্ষার সারাৎসার বিশেষ। তাঁর মতে, -

> "যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই ধর্ম।"[১২]

দীর্ঘদিনের নিবিড় অনুশীলন ব্যতিরেকে এই আত্মোন্নতি সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শ যুবকদের তাই উপনিষদ থেকে কেবল শ্লোক আওড়ানো নয়, তার দুর্মূল্য ভাব ও ধারণাগুলি আত্মস্থ করার কথা বলেছেন, যাতে প্রাচীন ভারতের সেই সত্যসন্ধানী দৃষ্টি দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে একসময় তা পুরোপুরি সংস্কারে পরিণত হয়। কেননা, -

> "উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়।"[১৩]

এভাবে বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের বেদান্তবাদের কাছে বারবার শরণাপন্ন হয়েছেন এবং এর অন্তর্নিহিত ধী-শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষকে জাগরিত করতে চেয়েছেন।

ঔপনিষধিক প্রভাব থেকে রবীন্দ্রনাথও কোনোভাবে বিযুক্ত নন। তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্ম ও সামগ্রিক চিন্তা-চেতনায় তো বটেই, শিক্ষাসম্বন্ধীয় ভাবনাতেও একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে উপনিষদ প্রসঙ্গ। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শকে তিনিও অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ওভারটুন হল-এর বক্তৃতায় তিনি তপোবনের আশ্রমিক শিক্ষাকে ভারতের 'ন্যাশনাল সাধনা' বলে অভিহিত ক'রে সেই আদর্শকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন। শুধু পরামর্শ নয়, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসে (৭ই পৌষ ১৩০৮) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা প্রদান করেন, সেখানে প্রকৃতির ক্রোড়লালিত প্রাচীন তপোবনের উদারতার শিক্ষাকে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পালন করবার ঘোষনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি লালিত তপোবনের শিক্ষায় ব্যক্তির আত্মবিকাশের পূর্ণতা লক্ষ করেছিলেন। তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কোনো বিদ্যায় পারদর্শী হতে সাহায্য ক'রে ঠিকই কিন্তু আশ্রমিক শিক্ষা ছাত্রদের প্রকৃতঅর্থে 'ভোক্তৃত্বের অধিকার' থেকে 'কর্তৃত্বের অধিকার' অর্জন করতে শেখায়, কর্তাভজার ঘৃণ্য মানসিকতার পরিবর্তে তাঁকে সার্বিকভাবে স্বাবলম্বী ক'রে তোলে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের এই তপোবনের ছাঁচকে অনেকাংশে অনুসরণ ক'রে গড়ে উঠেছিল।

মনুষ্যত্বের জাগরণে শিক্ষক বনাম গুরু—

পরিপূর্ণভাবে আত্মকর্তৃত্ব অর্জনের শিক্ষায় পথপ্রদর্শকরূপে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত আবশ্যক। যদিও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই শিক্ষকের চেয়ে 'গুরু' শব্দটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যাঁকে

পাওয়া যায়, বেতনের বিনিময়ে শিক্ষা দান করা তাঁর কাজ। নিজের দায়িত্ব নিপুণভাবে সম্পাদন করা ছাড়া তাঁর থেকে অধিককিছু আশা করা সমীচীন নয়। স্রেফ প্রয়োজনের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছাত্র-শিক্ষকের এহেন সম্পর্কে হৃদয়-মনের কোনোরূপ সংযোগ ঘটে না। স্বভাবতই শিক্ষক-ছাত্রের হৃদয়হীন এ সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের বরাবর না-পসন্দ ছিল। শিক্ষক ও গুরুর আলাদা আলাদা স্বরূপ বিষয়ে তাঁর মত, -

> "ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে।"[১৪]

সিলেবাসের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষককে এবার গুরুর ভূমিকায় পাওয়া গেল, তাই শুধু প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জ্ঞানপিপাসু শিষ্যের কাছে এবার জীবনের পাঠ দেওয়ার পর্ব শুরু হল তাঁর। গুরুর আসনে বসে হৃদয়মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তিনি একবার যা দান করবেন তা মূল্যের বিনিময়ে কেনা পণ্যদ্রব্য নয়, কর্তব্যের দায়ভারের পরিবর্তে অন্তর থেকে তা দেওয়া হবে বলেই মূল্য দিয়ে তার পরিমাপ চলে না। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে ঘরে বাইরে (১৯১৬) উপন্যাসের চন্দ্রনাথবাবু কিংবা মাস্টারমশায় (প্রবাসী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪) গল্পের হরলাল মাস্টারের কথা। যাঁরা সারাজীবন নিঃস্বার্থভাবে অপার সান্নিধ্যদানের মাধ্যমে ছাত্রদের জীবনের পথে চালিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিক্ষাদাতারূপে এইরকম গুরুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, যিনি প্রথাগত পাঠের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে কেবল সাফল্যের চটজলদি সমাধানসূত্র বিবৃত করবেন না বরং যেখানে জীবনের মহৎ পাঠ নিঃস্বার্থভাবে দেবার ভিতরে পাওয়ার অপরিসীম আনন্দ থাকবে লুকিয়ে। কারণ, -

> "গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।"[১৫]

বিবেকানন্দের গুরুসম্পর্কিত ভাবনা রবীন্দ্রধারণার থেকে দূরবর্তী নয়। তাঁর মতে, আত্মা থেকে আত্মায় শক্তিসঞ্চারের ক্ষমতার মধ্যেই প্রকৃত শিক্ষকের ধর্ম নিহিত। প্রকৃত শিক্ষক বাইরে থেকে অভাবিত নতুনকিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার নিজস্বতার হানি ঘটাতে চাইবেন না, শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম থেকে পূর্ণতাবোধের যে সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে, বিকাশের পথে তার বাধাগুলি অপসারণে তিনি সাহায্য করবেন মাত্র। এইজন্য তাঁকে সমস্ত অহং ত্যাগ ক'রে শিক্ষার্থীর অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যাওয়া দরকার। অপরের ভাব বা নিজস্বতা নষ্ট করার চেষ্টাতে বিবেকানন্দ প্রকৃত শিক্ষার কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি। কারণ, যথার্থ গুরু তাঁকেই বলা যাবে, -

> "যিনি নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন।"[১৬]

ভারতের দুরাবস্থা দূর করতে অন্যের কল্যাণ করবার ইচ্ছাকে সমূলে বিনাশ করার কথা বলেছেন তিনি। কারণ, শিক্ষার নামে অপরের স্বাভাবিক প্রবণতা মুছে ফেলে কখনও কারও কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। সহজ উদাহরণ সহযোগে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা, বীজকে জল-মাটি ও উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা ক'রে দিলে সে যেমন নিজের সামর্থ্যের বশে ধীরেধীরে বেড়ে উঠতে থাকে, তেমনই শিক্ষার্থীকে নিজের বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করার মধ্যেই শিক্ষাদানের সম্পূর্ণতা।[১৭] কারণ, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল মানুষ তৈরি করা। সে মানুষ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত হবে এমনটা নয়, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উচ্চ হৃদয়বৃত্তিও সমানভাবে আবশ্যক এবং শারীরিকভাবেও তাঁকে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া দরকার যাতে উচ্চ আদর্শের চিন্তা-ভাবনাগুলি যেন হাতে-নাতে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা করা যায়। মানুষকে এই সমগ্রতার শিক্ষায় সমর্থ ক'রে তোলা বা 'Complete Education'-এর পাঠ দেওয়াই ছিল বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার মূল উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের এই শিক্ষাদর্শন নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় চালুর প্রস্তাব হোক বা বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষা, উভয়ের শিক্ষাসম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তৎকালীন দেশীয় প্রয়োজন তির্যকভাবে নিহিত ছিল। বর্তমানের প্রেক্ষিতে সেইসব ভাবনা-চিন্তার গুরুত্ব এখানেই যে, যুক্তি-প্রযুক্তির নবনির্মাণের যুগে দাঁড়িয়ে এখনও আমরা পুরোপুরি রবীন্দ্রকথিত 'স্বরাজ' অর্জন

করতে পারিনি। আজও স্বভাবের দুর্বলতা আমাদের হাড়ে-মজ্জায় জড়িয়ে, অন্ধভাবে পরানুকরণ ও সহজে তোষামুদে মেজাজকে এখনও আমরা উপায়সিদ্ধির সরল পথ বলে বিবেচনা করে থাকি। কর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোলাচলতায় আজও আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এ থেকে সহজে ধারণা করা চলে যে, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ত্রুটি রয়ে গেছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন বর্তমান যুগ ও প্রয়োজনের নিরিখে পুনঃপাঠের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯, পৃ. ৪
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বাহন', শিক্ষা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৭, পৃ. ১৪৮
৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭১, পৃ. ৪৪২
৪. 'গ্রন্থপরিচয়', শিক্ষা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৭, পৃ. ২৬৩
৫. তদেব, পৃ. ২৬৪
৬. 'কর্তার ভূত', রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৬৩৭
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বাহন', শিক্ষা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৭, পৃ. ১৪৮
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'এবার ফিরাও মোরে', চিত্রা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৮২, পৃ. ২৮
৯. উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, পৃ. ২৬৬
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বাহন', শিক্ষা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৭, পৃ. ১৫০
১১. তদেব, পৃ. ১৫১
১২. স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ. ৫৫
১৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭১, পৃ. ১৩০
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষাসমস্যা', শিক্ষা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৭, পৃ. ৪৯
১৫. 'আশ্রমের শিক্ষা', তদেব, পৃ. ২৪৫
১৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭১, পৃ. ৪০৪-৪০৫
১৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭১, পৃ. ১৩৯